UNIC Dhaka

জাতিসংঘ সংবাদ
DATELINE UN

A Monthly News Bulletin from UNIC Dhaka

INTERNATIONAL YEAR OF SANITATION 2008

এপ্রিল ২০০৮ April 2008

২০তম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা Volume-XX, No. IV

মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোর পূর্ববর্তী ইতিহাস

উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘে চার দশকের সংগ্রাম

২০০০ সালে জাতিসংঘ যখন মিলেনিয়াম ঘোষণা গ্রহণ করে তখন উন্নয়ন পর্বে সন্নিবেশিত লক্ষ্য ও নিশানাগুলো পরিশেষে মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্য হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। অবশ্য এমডিজি নতুন কোনো এজেন্ডার অংশবিশেষ নয়, বরং এগুলো হলো বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য বছরের পর বছর ধরে আলোচনা, প্রচেষ্টা ও সংগ্রামকে পুনরায় উপস্থাপন করা।

দারিদ্র্য ও ক্ষুধা মোচন, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন ও লিঙ্গাভিত্তিক সমতা বৃদ্ধির বিষয় বরাবরই জাতিসংঘের উন্নয়ন এজেন্ডার পুরো ভাগে ছিল। বিগত বছরগুলোতে পরিষদ এসব ও অন্যান্য উন্নয়ন বিষয় আলাদা কিংবা সম্মিলিতভাবে বিবেচনা করেছে এবং এগুলোর সমাধানে প্রচেষ্টা চালিয়েছে। তবে ওইসব লক্ষ্য, প্রচেষ্টা ও উদ্যোগের পারস্পরিক সম্পর্কের গুরুত্ব ও যে কোনো একটির ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের উদ্দেশ্যে সবগুলোর ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জনের প্রয়োজন তুলে ধরার জন্য এমডিজি হলো সেগুলোকে একটি অভিন্ন কেন্দ্রবিন্দুতে নেয়ার একটি অধিকতর নিবিষ্ট প্রয়াস।

উন্নয়ন সর্বপ্রথম ১৯৬০ সালে জাতিসংঘের কার্যক্রমের একটি মুল প্রতিপাদ্যে পরিণত হয়। ওই বছরই ১৭টি নতুন সদস্য জাতিসংঘভুক্ত হয়, কোনো এক বছরে সদস্যভুক্তির সংখ্যা এটা সবচেয়ে বেশি।

এটা ছিল নব্য স্বাধীন দেশগুলোর প্রথম তরঙ্গ যা জাতিসংঘের সদস্য বিন্যাসে নাটকীয় পরিবর্তনের সূচনা করে। সে সময়ে উন্নয়নের সবচেয়ে জরুরি উৎকণ্ঠা ছিল বিশ্বের ক্ষুধা মোচন। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (ফাও) আফ্রিকা, এশিয়ার অংশবিশেষ এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের নতুন সদস্যের পরিস্থিতি এবং অনুরূপ অবস্থায় পতিত অন্যান্য দেশের পরিস্থিতি মোকাবেলায় ১৯৬০ সালের ১ জুলাই 'ক্ষুধা থেকে মুক্তি' শীর্ষক প্রচারাভিযানের যে আন্তর্জাতিক কার্যক্রমে নেতৃত্ব দেয় তা ক্ষুধা সমস্যার প্রতি বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ করে। এই কার্যক্রমে ক্ষুধার বিরুদ্ধে জাতীয় প্রচারণায় সরকার ও বেসরকারি সংস্থাগুলোকে (এনজিও) সহায়তাদানের আহ্বান জানানো হয়।

আরো সমন্বিত কার্যক্রমের প্রয়োজন

রয়েছে বলে বুঝতে পারার পর সাধারণ পরিষদ ১৯৬০ সালের ২৭ অক্টোবর ১৭১৪(১৬) সংখ্যক প্রস্তাবের মাধ্যমে স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে ক্ষুধার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহায়তাদানে সর্বাধিক সম্ভব উদ্বৃত্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করার পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রতি আহ্বান জানায়। অবশ্য পরিষদ দৃঢ়তার সঙ্গে বলে যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যকরভাবে ত্বরান্বিত করার মধ্যে ক্ষুধার চূড়ান্ত সমাধান নিহিত রয়েছে। প্রস্তাবের উদ্দেশ্য অনুযায়ী কাজ করার জন্য পরিষদ ১৯৬১ সালের ১৯ ডিসেম্বর ১৭১৪(১৬) সংখ্যক প্রস্তাবের মাধ্যমে ১০ কোটি ডলারের একটি স্বেচ্ছা তহবিল নিয়ে তিন বছরের জন্য পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লুএফপি) প্রতিষ্ঠা করে। জাতিসংঘ এবং বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার যৌথ দায়িত্বে এই কর্মসূচির পরিচালনা ন্যস্ত করা হয় এবং কাজ চালানোর সুবিধার্থে প্রতি বছর নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে একটি প্রতিশ্রুতিদান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে বলে স্থির করা হয়। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর পুঁজি উন্নয়নের প্রয়োজন পূরণের একটি বাড়তি ব্যবস্থা হিসেবে ১৫ ডিসেম্বর ১৫২১(১৫) সংখ্যক প্রস্তাবের মাধ্যমে জাতিসংঘ পুঁজি উন্নয়ন তহবিল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তও পরিষদ গ্রহণ করে।

সমস্যাটি ক্ষুধার চেয়ে বেশি ব্যাপক, এটা স্বীকার করে পরিষদ ১৯৬১ সালের ১৯ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের প্রস্তাব অনুসারে ১৭১০(১৬) সংখ্যক প্রস্তাবের মাধ্যমে ১৯৬০-এর দশককে 'জাতিসংঘ উন্নয়ন দশক' হিসেবে ঘোষণা করে। বলা হয় যে, দশক চলাকালে উন্নয়নশীল দেশগুলো যে লক্ষ্য নির্ধারণ করবে তাতে ন্যূনতম বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার হবে মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৫ ভাগ। পরিষদ নিরক্ষরতা, ক্ষুধা ও ব্যাধি দূর করার ত্বরান্বিত ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বানও জানায়। উন্নয়নের বিষয় সমাধানের লক্ষ্য সংবলিত আন্তর্জাতিক প্রচারণায় নিজস্ব উৎকণ্ঠা ও প্রেক্ষিতের প্রতিফলন নিশ্চিত করার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলো ১৯৬২ সালের ৯ থেকে ১৮ জুলাই মিসরের কায়রোয়

অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমস্যা সম্মেলনের আয়োজন করে। ১৮ ডিসেম্বর উন্নয়নশীল দেশগুলোর কায়রো ঘোষণা গ্রহণের পর পরিষদ সুপারিশ করে যে, উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রশ্ন নিয়ে কাজ করার সময় জাতিসংঘ ব্যবস্থা এই ঘোষণার নীতিমালা বিবেচনা করে দেখবে।

দশকের লক্ষ্যগুলো জোরদার করার লক্ষ্যে ১৯৬৩ সালের ১১ ডিসেম্বর ১৯৪৩(১৮) সংখ্যক প্রস্তাবের মাধ্যমে পরিষদ দশকের দ্বিতীয়ার্ধে ক্ষুধা, ব্যাধি ও অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে এনজিও পরিচালিত বিশ্ব প্রচারণার প্রতি সমর্থনদানের আহ্বান জানায়। পরিষদ প্রাথমিক পণ্য রপ্তানির জন্য বাজার সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৬৪ সালের ৩০ ডিসেম্বর ১৯৯৫(১৯) সংখ্যক প্রস্তাবের মাধ্যমে জাতিসংঘ বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলন (আঙ্কটাড) এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোকে কারিগরি পরামর্শ পরিসেবা ও প্রশিক্ষণ সুযোগ দেয়ার লক্ষ্যে ১৯৫০ সালে গঠিত সম্প্রসারিত কারিগরি সহায়তা কর্মসূচি এবং তাদের উৎপাদন সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৫৯ সালে গঠিত জাতিসংঘ বিশেষ তহবিল একীভূত করে ১৯৬৫ সালে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) এবং জাতিসংঘ শিল্পোন্নয়ন সংস্থা (ইউনিডো) প্রতিষ্ঠা করে। ক্ষুধা মোচনের উন্নয়ন লক্ষ্যের প্রতি হিজ হলিনেস পোপ ষষ্ঠ পলও সমর্থন জানান। বিশ্বের দরিদ্র ও ক্ষুধার্ত মানুষের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে ১৯৬৫ সালের ৪ অক্টোবর পরিষদে তিনি বলেন, এর কাজ হলো 'মানবজাতির টেবিলে পর্যাপ্ত রুটি থাকা নিশ্চিত করা।' একই বছর ২০৯৫(২৪) সংখ্যক প্রস্তাবের মাধ্যমে পরিষদ বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির অব্যাহত সম্প্রসারণ অনুমোদন করে এবং ১৯৬৬-৬৮ সালে স্বেচ্ছা চাঁদার লক্ষ্য ২৭ কোটি ৫০ লাখ ডলার নির্ধারণ করে। ২০৯৬(২০) সংখ্যক প্রস্তাবের মাধ্যমে কার্যকরভাবে ক্ষুধা মোকাবেলায় ব্যাপকভিত্তিক আন্তর্জাতিক কার্যক্রমের উপায় ও নীতি খতিয়ে দেখা ও প্রস্তাব করার জন্য খাদ্য ও কৃষি সংস্থার নির্বাহী পরিচালককে দায়িত্ব প্রদান করে। আঙ্কটাড, বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সহযোগিতায় প্রণীত সেই সমীক্ষার ভিত্তিতে ১৯৬৮ সালের ২৪৬২(২৩) সংখ্যক প্রস্তাবে পরিষদ ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে বহুপক্ষীয় খাদ্য সাহায্য আরো সমন্বয় করার জন্য ডব্লুএফপি-কে অন্যান্য আগ্রহী সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করার আহ্বান জানায়। এর ফলে ১৯৬৯ সালে ডব্লুএফপি প্রথমবারের মতো তার প্রতিশ্রুতির লক্ষ্য ২০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে ২৬ কোটি ৫০ লাখ ডলারে পৌঁছে যায়।

এতসব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও প্রথম উন্নয়ন দশকের মধ্য পর্যায় নিরূপণে মহাসচিব স্বীকার করেন যে, কেবল সীমিত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে, চূড়ান্ত লক্ষ্য

এখনো অনেক দূরে। এই ব্যর্থতার আলোকে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্রমবর্ধমান চাহিদার স্বীকৃতি হিসেবে পরিষদ ১৯৭০ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘের পঞ্চবিংশতিতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৭১ সালের ১ জানুয়ারি থেকে দ্বিতীয় জাতিসংঘ উন্নয়ন দশক ঘোষণা করে। এ উপলক্ষে দশকের লক্ষ্যগুলো অর্জনের উদ্দেশ্যে ২৬২৬(২৫) সংখ্যক প্রস্তাবের মাধ্যমে পরিষদ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করে। এই কৌশলের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো হলো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আর্থিক সম্পদ স্থানান্তরের একটা বড় অংশ সরকারি উন্নয়ন সাহায্য (ওডিএ) হিসেবে দেয়ার আহ্বান, দশকের মাঝামাঝি সময় নাগাদ উন্নত দেশগুলোকে তাদের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের কমপক্ষে ০.৭ শতাংশ হারে এ সাহায্য দিতে হবে এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তবে পরবর্তী বছরগুলোর ঘটনাপ্রবাহের কারণে দ্বিতীয় উন্নয়ন দশকের বাস্তবায়ন কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। ১৯৭১ সালে মুদ্রার মূল্যের নিরিখে স্বর্ণমান পতনের ফলে বিশ্বে সঙ্কট দেখা দেয়, যাতে বেশ কয়েকটি দেশ আটকে পড়ে। তেলের মূল্যের ওপর এর প্রভাব এবং ১৯৭৩ সালে ইসরাইল ও আরব দেশগুলোর মধ্যে জোম কিপুর যুদ্ধের সূচনা, পরবর্তীকালে তেল রপ্তানিকারক রাষ্ট্র সংস্থার (ওপেক) কয়েকটি দেশের আরোপিত তেল নিষেধাজ্ঞা এবং ১৯৭৪ সালে বিশ্ব পণ্যমূল্যের পতনের সচল মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা আরো বেড়ে যায়।

বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতির বহিঃঅর্থনৈতিক অবনতিশীল পরিবেশ, খাদ্য ঘাটতি, উন্নয়নশীল দেশগুলোর দায় পরিশোধ স্থিতিপত্রের প্রতিকূল অবস্থা, উন্নত বাজার অর্থনীতিতে মন্দা ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর বাণিজ্য সম্ভাবনায় দুর্গতির চিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে পরিষদ ইতালির রোমে ১৯৭৪ সালের ৫ থেকে ১৬ নভেম্বর বিশ্ব খাদ্য সম্মেলন আহ্বান করে। সম্মেলন ক্ষুধা ও অপুষ্টি দূর করার সর্বজনীন ঘোষণা গ্রহণ করে যাতে স্বীকার করা হয় যে, কেবল অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেই নয় বরং ১৯৪৮ সালের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় বর্ণিত জীবন ও মানবিক মর্যাদার সঙ্গে সংশি-ষ্ট মৌলিক নীতিমালা ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও খাদ্য সঙ্কটের সংশে-ষ রয়েছে। এতে কৃষি সংশি-ষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য একটি বিশ্ব খাদ্য পরিষদ গঠনের প্রস্তাব এবং জাতীয়ভাবে শস্য সংরক্ষণ পদ্ধতির ভিত্তিতে খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি বিশ্ব উদ্যোগ সম্পন্ন করা হয়। ১৭ ডিসেম্বর পরিষদ বিশ্ব খাদ্য পরিষদ গঠন করে এবং একটি আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিলের বিশদ বিষয়াদি প্রণয়নের জন্য মহাসচিবকে একটি বৈঠক আহ্বানের অনুরোধ জানায়।

১৯৭৫ সালে দ্বিতীয় উন্নয়ন দশকের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কৌশলের মধ্যমেয়াদি যে পর্যালোচনা পরিষদ করে তা এক পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে সম্পন্ন হয়, যার ভিত্তি ১৯৭০-এর দশকের প্রথমার্ধের অর্থনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে নাড়া খেয়েছিল। উন্নয়নশীল দেশগুলো এক নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আহ্বান জানানোর মধ্য দিয়ে এই পরিস্থিতি থেকে একটা অধিকতর শক্তিশালী উপাদান হিসেবে বেরিয়ে আসে। আনুষ্ঠানিকভাবে বৃহৎ শক্তির কোনো জোটে অন্তর্ভুক্ত বা তার বিপক্ষে নয় বলে বিবেচিত জোটনিরপেক্ষ দেশগুলোর পক্ষে আলজিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হুয়ারি বুমেদিন 'কাঁচামাল ও উন্নয়নের সমস্যা খতিয়ে দেখার' জন্য পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন আয়োজনের অনুরোধের মধ্য দিয়ে এ আহ্বান জানান। এসব দেশ মনে করে যে, জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণে উন্নত দেশগুলোর রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবসহ বেশ কয়েকটি কারণে দ্বিতীয় উন্নয়ন দশকের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কৌশল ব্যর্থ হয়েছে।

সাধারণ পরিষদ তাই ১৯৭৪ সালের ৯ এপ্রিল তার ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করে। এই অধিবেশনে একটি নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ঘোষণা গ্রহণ করা হয় [প্রস্তাব সংখ্যা ৩২০১ (এস-৬)]। এতে নয়া ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে ২০টি নীতি সন্নিবেশিত হয়। সম্মেলনে জরুরি কর্মসূচিও গ্রহণ করা হয় [প্রস্তাব সংখ্যা ৩২০২ (এস-৬)]। জরুরি কর্মসূচিতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থা সংস্কার ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন লক্ষ্যে অর্থায়নের প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিশ্ব অর্থনৈতিক সঙ্কটে ক্ষতিগ্রস্ত স্বল্পোন্নত ও ভূবেষ্টিত দেশগুলোর দুর্দশা লাঘবে সম্মেলনে জরুরি ব্যবস্থার একটি বিশেষ কর্মসূচিও গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৪ সালের ৬ ডিসেম্বর ৩২৮১(২৯) সংখ্যক প্রস্তাবের মাধ্যমে পরিষদ অর্থনৈতিক অধিকার ও রাষ্ট্রগুলোর দায়িত্ব সনদ গ্রহণ করে, যার সূচনা ১৯৭২ সালে আঙ্কটাডের তৃতীয় অধিবেশন থেকে শুরু হয়েছিল।

উন্নয়নশীল দেশগুলো আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কৌশলের নীতি ব্যবস্থাগুলো বহুলাংশে বাস্তবায়ন না করায় সাধারণ পরিষদ ১৯৮০ সালের ৫ ডিসেম্বর ৩৫/৩৬ প্রস্তাবের মাধ্যমে তৃতীয় জাতিসংঘ উন্নয়ন দশকের (১৯৮১–১৯৯০) জন্য নতুন উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করে ১৯৮০–এর দশকের জন্য নীতি ও উদ্দেশ্য এবং বাস্তবায়নের জন্য নীতি ব্যবস্থা নির্ধারণ করে, যার মাধ্যমে দ্বিতীয় উন্নয়ন দশকে নীতি ব্যবস্থা সম্পূরণ ও সম্প্রসারণ করা হয়। এতে ১৯৯০ সালের মধ্যে অর্জনের জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়, যাতে রয়েছে উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রবৃদ্ধির হার জিডিপির শতকরা ৭.৫ ভাগ ও রপ্তানির হার শতকরা ৮ ভাগ, মোট বিনিয়োগ শতকরা ২৮ ভাগ ও মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় জিডিপির শতকরা ২৪ ভাগ, উন্নয়নশীল দেশগুলোর জিডিপির শতকরা ০.৭ ভাগ অর্জন ও অতিক্রমের জন্য সুবিধাজনক শর্তে অর্থায়ন, দারিদ্র্য হ্রাস ও বিদুরণ, উলে–খযোগ্য হারে মৃত্যু হ্রাস, যথাসময়ের পুর্বে নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাসহ আন্তর্জাতিক কাঠামোর পরিবর্তন এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থার পরিবর্তন। ১৯৮৪ সালে তৃতীয় উন্নয়ন দশকের পর্যালোচনা ও মুল্যায়ন করতে গিয়ে পরিষদ বলেছে যে, নতুন একটা আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানানোর পর দশ বছর অতিক্রান্ত হলেও এ লক্ষ্যে কোনো অগ্রগতিই হয়নি। অধিকন্তু তৃতীয় দশকের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যও অর্জিত হয়নি।

১৯৯০ সাল নাগাদ উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে ব্যবধান বাড়তে থাকে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জীবনযাত্রার মান ও প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনার অবনতি ঘটে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও অর্থায়নে তাদের অবস্থান বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে। এই মন্দাবস্থায় ১৯৯০ সালের বিশেষ অধিবেশনে সাধারণ পরিষদ উন্নয়নশীল দেশগুলোর, বিশেষ করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন বেগবান করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা ঘোষণা গ্রহণ করে, ওইসব দেশের জন্য ১৯৯০–এর দশকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ চ্যালেঞ্জ ছিল বলে পরিষদ উলে–খ করে। পরিষদ চতুর্থ জাতিসংঘ উন্নয়ন দশকও

(১৯৯১–২০০০) ঘোষণা করে এবং ১৯৯০–এর দশক উন্নয়নশীল দেশগুলোর ত্বরান্বিত উন্নয়ন প্রত্যক্ষ করবে বলে প্রত্যাশা নিয়ে দশকের জন্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করে। দশকের বাস্তবায়নে বেশ কয়েকটি সহায়ক কার্যক্রম ছিল : স্বল্পোন্নত দেশগুলো সংক্রান্ত দ্বিতীয় জাতিসংঘ সম্মেলন (১৯৯০ সালের ৩ ও ৪ সেপ্টেম্বর) যা প্যারিস ঘোষণা ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য একটি জরুরি কর্মসুচি গ্রহণ করে।

ক্ষুদ্র দ্বীপ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর স্থিতিশীল উন্নয়ন সংক্রান্ত বিশ্ব সম্মেলন (১৯৯৪ সালের এপ্রিল/মে) যা বারবাডোস ঘোষণা ও ক্ষুদ্র দ্বীপ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য একটি জরুরি কর্মসুচি গ্রহণ করে এবং বিশ্ব সামাজিক উন্নয়ন শীর্ষ সম্মেলন (১৯৯৫ সালের ৬ থেকে ১২ মার্চ), যা সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত কোপেনহেগেন ঘোষণা এবং বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলনের জন্য জরুরি কর্মসুচি গ্রহণ করে। আরো গুরুত্বপুর্ণ হলো, ১৯৯৪ সালের জুনে পরিষদ নিউইয়র্কে উন্নয়নের ওপর বিশ্ব শুনানির আয়োজন করে। জাতিসংঘ যেসব ব্যাপক অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয় নিয়ে কাজ করে তার প্রতি একটা সমন্বিত উদ্যোগ হিসেবে ১৯৯২ সালে মহাসচিবের প্রস্তাবিত জাতিসংঘ উন্নয়ন এজেন্ডার বিশদ বর্ণনা হিসেবে এসব বিশেষজ্ঞ পরামর্শ গ্রহণ করা হয়।

অগণিত সম্মেলন, পরামর্শ, ঘোষণা ও কৌশলের মাধ্যমে ১৯৯০ দশকের উন্নয়ন চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় গতি সঞ্চারিত হলেও এসব প্রচেষ্টা ব্যাহত করার মতো নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ দেখা দেয়। এগুলোর মধ্যে ছিল আফ্রিকা, আমেরিকা ও পুর্ব ইউরোপে বেশ কয়েকটি সশস্ত্র সংঘাতের সুচনা, যার জন্য প্রয়োজন হয় বড় ধরনের জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা ও মানবিক কার্যক্রম এবং পুর্ব ইউরোপে গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের পর কেবল উন্নয়নশীল দেশগুলো নয়, বরং নতুন নতুন উত্তরণশীল অর্থনীতির চাহিদা মেটানোর জন্য অতিরিক্ত উন্নয়ন সহায়তায় বাড়তি প্রয়োজন। এছাড়া ব্রাজিলের অর্থনীতির অনিশ্চয়তার কারণে সৃষ্ট অবস্থা থেকে উত্তরণে বিশ্ব অর্থনীতির গতি ছিল মন্থর। তাই অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জাতিসংঘকে তার উন্নয়ন প্রচেষ্টা পুনর্বিন্যাস করতে হয়। এই প্রেক্ষিতে ১৯৯৭ সালের জুনে পরিষদ উন্নয়নের জন্য এজেন্ডা গ্রহণ করে [প্রস্তাব ৫১/২৪০], যা শান্তি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পরিবেশের সুরক্ষা, সামাজিক ন্যায়বিচার ও গণতন্ত্রের মতো

উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয় ও উপাদানের সমন্বয়ে একটি উন্নততর জীবন মান অর্জনের বহুমাত্রিক উদ্যোগ সংবলিত একটি ব্যাপক দলিল। এই এজেন্ডা হলো উন্নয়নের ওপর সর্বপ্রথম সমন্বিত মনোসংযোগ। পরিষদ দারিদ্র্যের প্রতিও বিশেষ মনোনিবেশ করে ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে [প্রস্তাব ৫২/১৯৩] প্রথম জাতিসংঘ দারিদ্র্য মোচন দশক (১৯৯৭-২০০৬) ঘোষণা করে। দশকের লক্ষ্য ছিল চরম দারিদ্র্য বিদুরণ ও বিশ্ব থেকে ব্যাপক হারে দারিদ্র্য হ্রাস। ১৯৯৩ সালে পরিষদ ঘোষিত আন্তর্জাতিক দারিদ্র্যবিরোধী বর্ষ পালিত হয় ১৯৯৬ সালে।

১৯৯০-এর দশকের শেষ দিকে উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের অর্থনীতি উদারনীতিকরণ ও তা বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে সমন্বিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এই প্রেক্ষাপটে বিশ্বায়নের সুফল ও বিশ্ব অর্থনীতিতে ক্রমবর্ধমান পারস্পরিক নির্ভরশীলতার প্রতি আন্তর্জাতিক মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সঙ্গে বিশ্বায়নের সম্পৃক্ততার নিরিখে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এর অভিঘাত খতিয়ে দেখার জন্য সাধারণ পরিষদ ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বরে দু'দিনব্যাপী একটি উচ্চ পর্যায়ের সংলাপের আয়োজন করে। ১৯৯৯ সালে দশকের এক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উন্নয়নের অগ্রগতি মিশ্র, অনেক চ্যালেঞ্জ এখনো বহাল রয়ে গেছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কথা বলতে গেলে তা উন্নয়নের পর্যাপ্ত কোনো উপাদান আর নয়। উন্নয়নের জন্য দৃষ্টি বেশ কয়েকটি প্রাতিষ্ঠানিক পুর্বশর্তের দিকে স্থানান্তরিত হয়ে যায়, যার মধ্যে রয়েছে সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, বিকেন্দ্রীকরণ ও অংশগ্রহণ এবং সামাজিক নিরাপত্তা। ২০০০ সালের মিলেনিয়াম ঘোষণা দারিদ্র্য এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের বিষয়গুলো সামগ্রিকভাবে সমাধানের জন্য এসব অগণিত প্রচেষ্টাকে একসুত্রে গ্রথিত করতে চাইছে। দু'বছর পর এর পরিপূরক হিসেবে অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অর্থায়ন সম্মেলন (মার্চ ২০০২), এতে গৃহীত হয় উন্নয়ন অর্থায়ন সংক্রান্ত মন্টেরি ঐকমত্য। এতে স্বীকার করা হয়েছে যে, ১৯৭০ সালে ওডিএ হিসেবে যে ০.৭ ভাগ লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল তা পূরণ করা হয়নি। এতে উন্নত দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলা হয় যে, যারা এ লক্ষ্য পূরণ করেনি, এমডিজি অর্জন করতে হলে ওডিএর লক্ষ্য পুরণে তাদের প্রচেষ্টা দ্বিগুণ করতে হবে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এখন ঘোষণার উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নের মধ্যবর্তী পর্যায়ে রয়েছে। এমডিজি অর্জনে বিশ্বের কোনো কোনো অংশ বেশ অগ্রসর হলেও সামগ্রিক বাস্তবায়ন পিছিয়ে আছে। বিভিন্ন উন্নয়ন দশক ও কৌশলকে ব্যর্থতা হিসেবে নয় এবং উন্নয়নের নিদারুণ সমস্যা সমাধানে দীর্ঘ সংগ্রামে একটা বর্ধিত পদক্ষেপ এবং সদা পরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক পরিবেশের গতিময়তার সঙ্গে সঙ্গতি বিধান ও সমস্যাটিকে বৃহত্তর প্রেক্ষিতে নেয়ার জাতিসংঘের অনশন প্রচেষ্টা হিসেবে দেখতে হবে।

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সাম্প্রতিক কার্যক্রম

সম্প্রতি অন্তরঙ্গ শিশু সংগঠন শিশুদের জন্য অনুষ্ঠিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে এক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা। এছাড়া অন্তরঙ্গ শিশু সংগঠনের কর্মকর্তাবৃন্দ বক্তব্য প্রদান করেন।

বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করছেন অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ

বক্তব্য রাখছেন জনাব কাজী আলী রেজা

স্বল্পোন্নত দেশে গর্ভকালীন নিরাপত্তা বিধান প্রাপ্ত পরিসেবাদানের চ্যালেঞ্জ

নিরাপদ মাতৃত্ব উদ্যোগ চালু এবং জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সবচেয়ে মারাত্মক অন্যায্যতার বিষয়টি তুলে ধরার জন্য ২০ বছর আগে কেনিয়ার নাইরোবিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সমবেত হয়েছিল। এই লোমহর্ষক অবিচার সংশোধন করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক সদিচ্ছা সৃষ্টি, কার্যকর প্রচেষ্টা চিহ্নিত এবং সম্পদের ব্যবস্থা করার জন্য বিশ্বজোড়া এই উদ্যোগ গড়ে তোলা হয়। এতদসত্ত্বেও বিশ্বে এখনো ৩৩ লাখ শিশু মৃত ভূমিষ্ঠ হয় এবং ৪০ লাখের বেশি শিশু পৃথিবীর আলো দেখার ২৮ দিনের মধ্যে মারা যায়। গর্ভকাল, প্রসবকাল বা প্রসবের পর প্রায় ৫ লাখ ৩৬ হাজার নারীর অনেক ক্ষেত্রেই আকস্মিক, অভাবনীয় মৃত্যু ঘটে, যে মৃত্যু রেখে যায় বিপর্যস্ত পরিবার, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনেক দেরিতে বা নিষ্ফল স্বাস্থ্যসেবায় ব্যয়ের কারণে সেসব পরিবার দৈন্যদশায় পতিত হয়।

ক্রমবর্ধমানসংখ্যক উন্নয়নশীল দেশ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মা ও তাদের নবজাতক সন্তানের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ বৃদ্ধিতে সফল হলেও যেসব দেশে মা ও নবজাতকের মৃত্যু ও খারাপ স্বাস্থ্যের হার ছিল সর্বোচ্চ ১৯৯০-এর দশকে সেসব দেশ অগ্রগতি অর্জন করেছে সবচেয়ে কম। কোনো কোনো দেশে পরিস্থিতির প্রকৃতই আরো অবনতি ঘটেছে। মা ও নবজাতকের মৃত্যুর যে চিত্র পাওয়া গেছে তা মারাত্মক। অগ্রগতির ধারা মন্থর ও ক্রমবর্ধমান হারে অসম হয়ে পড়ায় বিভিন্ন অঞ্চল ও দেশের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়া, একই দেশের ভেতরেও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে লক্ষণীয় অসমতা ও ব্যবধান রয়েছে। জাতীয় উপাত্তে অনেক ক্ষেত্রেই ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিকের মতো পর্যাপ্ত অভ্যন্তরীণ ভিন্নতার চিত্র আড়ালে থেকে যাচ্ছে। নগরবাসীর চেয়ে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দক্ষ সেবার সুযোগ কম, নগরীর বস্তিবাসীর মধ্যে মৃত্যুহার বেশি, জাতিসত্তা বা অর্থবিত্তজনিত ব্যবধানে মৃত্যু হারেও ব্যবধান হয় এবং প্রত্যন্ত এলাকায় অনেক ক্ষেত্রেই মৃত্যুহার খুব বেশি। পর্যাপ্ত প্রচেষ্টা জোরদার করা না হলে মা ও নবজাতকের পরিহারযোগ্য মৃত্যুরোধ করার আশা ক্ষীণ।

মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্য ও বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে যেসব জটিল সমস্যা দেখা দেয় তার বেশিরভাগের ক্ষেত্রেই সাড়াদানের মতো কারিগরি জ্ঞান যে রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। যেসব কৌশলের মাধ্যমে পরিবার ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যে মিলিতভাবে সবার জন্য, সঠিক স্থানে ও উপযুক্ত সময়ে কারিগরি সমাধানগুলো কাজে লাগানো নিশ্চিত করতে পারে তাও ক্রমবর্ধমান হারে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই কর্মসূচি খন্ড খন্ড করে নেয়া হলে সেবার ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয় বা পরিসেবায় পেশাদারিত্ব আনার প্রতি মনোযোগ দেয়া যায় না। কারিগরি অভিজ্ঞতা এবং সাম্প্রতিক অতীতের সাফল্য ও ব্যর্থতা থেকে দেখা গেছে যে, কেমন করে সবচেয়ে ভালোভাবে অগ্রসর হতে হবে।

প্রসবপূর্ব সেবা একটা সাফল্যগাথা। চাহিদা বেড়েছে এবং বিশ্বের বেশিরভাগ অংশে এই বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। তবে প্রসব-পূর্ব সেবার প্রচুর সম্ভাবনাকে কার্যকর উদ্যোগ হিসেবে গুরুত্বদান ও সেগুলোকে এইচআইভি/এইডস মোকাবেলা এবং যক্ষ্মা ও ম্যালেরিয়া এবং যৌনবাহিত রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসার মতো অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মসূচির জন্য একটা প-াটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করার মাধ্যমে আরো অনেক কিছু করা যেতে পারে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হলো পরিবার পরিকল্পনায় সহায়তাদান এবং লাখ লাখ অনভিপ্রেত, অসময়োচিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভ করার মতো গর্ভরোধকের বহুলাংশে অপূর্ণ চাহিদা পূরণ করা। বিশ্বে বছরে যে ১৩ কোটি ৬০ লাখ সন্তান প্রসব হয় তার সবগুলোতে সহায়তা করা বিশ্বের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বড় চ্যালেঞ্জগুলোর অন্যতম। বিশ্বের যেসব অংশে সন্তান প্রসব সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক প্রধানত সেসব অংশে তরুণ-তরুণীর দল প্রজনন বয়সে প্রবেশ করছে বলে এই চ্যালেঞ্জ আরো বেড়ে যাবে। জীবনদান করতে গিয়ে নারী মৃত্যুর ঝুঁকি নেয়। কিন্তু গর্ভাবস্থা, প্রসব ও প্রসবের অনতিপরে প্রাণহানির মতো মারাত্মক ও অক্ষমতা সৃষ্টির মতো প্রায় সবগুলো ঘটনা ঘটে বলে সে সময় দক্ষ ও সাড়ামূলক সেবার মাধ্যমে তা এড়ানো সম্ভব। বিকেন্দ্রিক, প্রথম পর্যায়ের সুবিধার মধ্যে এবং জীবনের প্রতি হুমকিপূর্ণ জটিলতার চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্য জরুরি ধাত্রীসেবা ও নবজাতকের সেবার প্রয়োজনে রেফারাল সেবার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ধাত্রীবিদ্যায় দক্ষতাসম্পন্ন একজন পেশাদার স্বাস্থ্যকর্মীর পক্ষে সবচেয়ে ভালোভাবে এ ধরনের সেবা দেয়া সম্ভব। তবে সেবার ফলপ্রসূতার উভয় পর্যায়কেই পাশাপাশি ও যুগপৎভাবে কাজ করতে হবে। এই কৌশল অবলম্বন করে অন্যান্যের মধ্যে বোতসোয়ানা, কেপভার্দে, চীন, কোস্টারিকা, কিউবা, হন্ডুরাস, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ আফ্রিকা ও থাইল্যান্ড মা ও নবজাতকের মৃত্যুহার উলে-খযোগ্য হারে কমিয়ে আনতে পেরেছে।

মায়ের স্বাস্থ্য ও বেঁচে থাকার সঙ্গে নবজাতকের স্বাস্থ্য ও বেঁচে থাকা নিবি-ড়ভাবে জড়িত। প্রথমত, স্বাস্থ্যবতী মায়েদের স্বাস্থ্যবান সন্তান হয়। দ্বিতীয়ত, গর্ভকাল, প্রসব ও প্রসব-পরবর্তী সময়ে মা অপ্রতুল বা কোনো সেবা না পেলে নবজাতকের ভাগ্যেও সচরাচর তাই ঘটে। তৃতীয়ত, প্রসবকালে যেসব শিশুর মা বেঁচে থাকে তাদের চেয়ে প্রসবকালে মাতৃহারা শিশুদের দু'বছর বয়সের মধ্যে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা তিন থেকে দশগুণ বেশি। মা ও নবজাতকের দক্ষ সেবা ও জরুরি সেবা লাভের সুযোগ থাকলে তাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বেশি। তাই নবজাতকের স্বাস্থ্যের অগ্রগতির জন্য ব্যয়বহুল প্রযুক্তির দরকার নেই, বরং দরকার হলো এমন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যা গর্ভকালের শুরু (এমনকি গর্ভকালের আগে) থেকে প্রসবকাল ও প্রসব-পরবর্তীকালে অব্যাহতভাবে পেশাদারি দক্ষ সেবা দিতে পারে। পরিবার, বিশেষ করে বাবা-মায়ের ক্ষমতায়ন অতি জরুরি, যাতে মা ও শিশু বাড়িতেই পর্যাপ্ত পরিচর্যা লাভ এবং

আগেভাগেই বিপদ বুঝে সমস্যা দেখা দেয়া মাত্র পেশাজীবীর সাহায্য গ্রহণ করতে পারে।

এ বিষয়ে জোর ঐকমত্য রয়েছে যে, সব সঠিক কারিগরি পছন্দ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হলেও মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্য কর্মসূচি কেবল তখনই ফলপ্রসূ হবে যদি তাতে পরিবার ও সমাজকে সম্পৃক্ত করে গর্ভকাল থেকে প্রসব ও নবজাতককাল পর্যন্ত স্তর পরম্পরায় সেবাকাজ সম্পাদন করা হয়। এই ধারাবাহিকতার জন্য অত্যন্ত শক্তিশালী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রয়োজন, যাতে উন্নয়ন কৌশলের মর্মমূলে থাকবে মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্যসেবা, সে সঙ্গে থাকবে সর্বজনীন পরিসেবার আওতা সংবলিত কার্যকর পরিকল্পনা।

মা ও নবজাতক পরিসেবা সর্বজনীন সুযোগ সংবলিত করার জন্য স্বাস্থ্য কর্মশক্তি নিয়োজন সর্বাগ্রে ও সর্বাধিক প্রয়োজন। অনেক দেশে স্বাস্থ্যকর্মী বণ্টনে ঘাটতি ও অসমতা দূর করা আগামী বছরগুলোর জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে থাকবে। এই কর্মশক্তিকে সমন্বিত ও সঙ্গতিপূর্ণভাবে পরিসেবা দিতে হবে। যোগ্য ও উৎপাদনশীল স্বাস্থ্যকর্মী আকৃষ্ট করা, উদ্বুদ্ধ করা ও ধরে রাখার জন্য প্রতিযোগিতামূলক পারিতোষিক ও উৎসাহভাতা দেয়ার স্থিতিশীল উপায় বের করতে হবে। অবশ্য সর্বজনীন সুযোগ একটি কার্যকর কর্মশক্তি বিনিয়োজনের চেয়ে বেশি। যেসব পরিসেবা দেয়া হবে তার জন্য সুযোগ গ্রহণ করার বাধা-বিপত্তি দূর করতে হবে এবং ব্যবহারকারীদের সেবা গ্রহণের ব্যয়ের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে পরিবারকে দারিদ্র্যে ঠেলে দিতে পারে এমন বিপর্যয়কর ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে অগ্রকথনযোগ্য আর্থিক সুরক্ষা দিতে হবে। কোনো কোনো দেশে অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা যুক্তিসঙ্গত আওতার মধ্যে মনে হলেও অনেক দেশেই তা এমন সাধ্যবহির্ভূত হতে পারে যা কেবল সরকারের পক্ষেই বহন করা সম্ভব। তাই, এ অবস্থা সামাল দেয়া এবং মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যখাত উন্নয়ন প্রয়াসের মর্মমূলে থাকা নিশ্চিত করার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলো ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য গড়ে তুলতে উলে-খযোগ্য সম্পদের ব্যবস্থা ও স্থানান্তর করতে হবে। ২০১৫ সালের মধ্যে মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো

পুরোপুরি অর্জিত না হলেও সর্বজনীন সুযোগ সৃষ্টির দিকে অগ্রসর হওয়ার মধ্যে আগামী দশকের পর দশক লাখ লাখ জীবনে রূপান্তর ঘটানোর সম্ভাবনা রয়েছে।

পরিশেষে গর্ভকালীন নিরাপত্তা বিধানের চ্যালেঞ্জের জন্য নতুন নতুন প্রযুক্তি বা কার্যকর উদ্যোগের নতুন জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। মা ও নবজাতকের জীবন বাঁচাতে যা করতে হবে তা আমরা জানি, তা হলো : পরিবার পরিকল্পনা, গর্ভকাল, প্রসবকাল ও প্রসব অনতিপরবর্তীকালে দক্ষ সেবা এবং সময়মতো জীবন রক্ষাকারী জরুরি ধাত্রী ও নবজাতক সেবার সুযোগ। চ্যালেঞ্জ হলো এসব পরিসেবা, বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ, নাগাল পাওয়া কষ্টকর এমন প্রান্তজন ও বর্জিত জনগোষ্ঠীর কাছে কীভাবে পৌঁছানো হবে এবং উদ্যোগের আওতা কীভাবে বিন্যাস করা হবে।

অগ্রগতির প্রধান বাধা-বিপত্তি হলো স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানব সম্পদের দক্ষতা ও ভৌগোলিক প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে কী প্রয়োজন ও কী আছে তার মধ্যে গুরুতর ঘাটতি ও অসঙ্গতি। অন্যান্য চ্যালেঞ্জ হলো অবনতিশীল অবকাঠামো মজুদ নিঃশেষিত ওষুধপত্র, সরবরাহ ও সরঞ্জাম হ্রাস, পরিবহনের অভাব, বিশেষ করে ধাত্রী সেবার ক্ষেত্রে মানসম্মত অকার্যকর রেফারাল ও সার্বক্ষণিক সেবা সুবিধা না থাকা এবং দুর্বল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি। আমাদের প্রয়োজন হলো কর্মসূচির বিষয়বস্তুর মনোযোগ পুনর্নির্ধারণ এবং নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন থেকে সেবার ধারাবাহিকতা ও প্রতিটি জন্ম বিবরণী নিশ্চিত করার মতো সম্ভাবনাময় সাংগঠনিক কৌশল গড়ে তোলার প্রতি গুরুত্ব স্থানান্তরের জন্য নীতিনির্ধারক ও কর্মসূচি ব্যবস্থাপকদের চ্যালেঞ্জ করা।

জীবনী

লেখক কাজী মনিরুল ইসলাম বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় গর্ভকালীন নিরাপত্তা বিধান দপ্তরের পরিচালক।

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : কাজী আলী রেজা, ফোন : ৮১১ ৮৬ ০০, ওয়েব : www.unicdhaka.org

A Monthly News Bulletin published by the United Nations Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor : Kazi Ali Reza, Phone : 811 86 00 e-mail : info.unic@undp.org, website : www.unicdhaka.org